...ও কেলেঘাই

জীবন-জীবিকা ও সাহিত্য

প্রথম সংখ্যা - মার্চ-২০২২

Volume-I, Issue-I
(2022)

বাংলায় বিশেষ নদীকেন্দ্রিক গবেষণা ও সাহিত্য চর্চার প্রথম ওয়েবসাইট-...ও কেলেঘাই

একটি নদীর নাম কেলেঘাই
ইচ্ছে হয় হিজলের শেকড় ছুঁয়ে
স্পর্শ করি নাভিমূল তার
জন্মের স্বাদ পেতে ছুটে যাই বাদিনা গ্রামের সবুজ ছায়ায়
শুয়ে থাকি ঘাসের শয্যায়...
আবার মিলনে প্রাপ্তি ভেবে
হলদির উপকূলে শান্তির খোঁজ পাই
আজো সে সহজিয়া নারী
আমার নদী, তোমারও তো
...ও কেলেঘাই ।

ওয়েবসাইট- www.keleghai.in
ই-মেল- o.keleghai@gmail.com
মোবাইল- ৯৬৪১৭৮৩৫৩৪

“...ও কেলেঘাই” একটি ওয়েব জার্নাল । কেলেঘাই একটি নদীর নাম। যার বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপাদান। এই জার্নালের প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে-

প্রথমতঃ তীরবর্তী সমাজের জীবন জীবিকায় কেলেঘাই নদী কতখানি অপরিহার্য ছিল এবং আছে তার মৌলিক অন্বেষণ।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের বিচিত্র শাখা প্রশাখার কল্লোলে কেলেঘাই নদীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া।

উপদেষ্টা- মনোতোষ আচার্য

সম্পাদক- ড. মৃন্ময় মণ্ডল

সহকারী সম্পাদক- শুভজিৎ জানা

পর্যালোচক- বিষ্ণুপদ দাশ

'...ও কেলেঘাই'র পক্ষে ড. মৃন্ময় মণ্ডল কর্তৃক পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৪৫৪ থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস- কৌশিক রায়

মুদ্রণ

সম্পাদকীয় দপ্তর এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা

'...ও কেলেঘাই', পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর- ৭২১৪৫৪

ওয়েবসাইট- www.keleghai.in ইমেল- o.keleghai@gmail.com

মোবাইল- ৯৬৪১৭৮৩৫৩৪

মূল্য – ২১ টাকা

-কলমে-

কল্পবোধ- বিষ্ণুপদ দাশ।। কৌস্তভ শতপথী।। মৃন্ময় মণ্ডল।। শুভদীপ চক্রবর্তী।।
সুমন মল্লিক।। পলি দে।। বিকাশ চন্দ।। মনোতোষ আচার্য।।
বাসুদেব গায়েন।। সন্দীপন বেরা।।

অনুগল্প- শুভজিৎ জানা ।।

অনুপ্রবন্ধ- শ্রী দেবাশিস কুইলা ।। বিশ্বসিন্ধু দে।। কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী ।।

-অল্পকথায়-

'নদী' জীবনের মত বহমান, 'নারীর' মত নীরবে উদ্ভিন্ন। সভ্যতার উদয় হতে নদী মাতৃরূপে পূজিত হয়। তার সৃষ্টিজাত নির্মাণ, নির্ভরতার আবেশে ঋণী এই পার্থিব জগত। বহু জনপদের আজন্ম ইতিকথা বহমানিত তার অবিরাম ধারা-উপধারায়। জনপদের প্রকীর্ণ কলতানে যেমন নীরব তার অনিন্দ্যকীর্তন, তেমনই আছে বেদনার জগতও। তার গভীর খাতে চিহ্নিত কত পারাপারের ইতিকথা যা বিস্মৃতির অতলতলে ডুকরে মরে। হারানো সেই দিনের নস্টালজিক পটভূমি, অক্ষরসজ্জায় মেলে ধরতে "...ও কেলেঘাই'র" পথচলা। নিতান্তই সাহিত্যের নিবিড়তায় আবিষ্ট না হয়ে, তীরবর্তী জনজাতির নদীমাতৃক অতীত ঐতিহ্য লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক "...ও কেলেঘাই"র কলেবর। তাই "...ও কেলেঘাই" খুঁজে বেড়ায় অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষকদের, যাদের লেখনীর মাধ্যমে কেলেঘাই হয়ে উঠবে বিশ্বের আঙিনায় এক স্রোতস্বিনী- জীবন্ত নদী।

"...ও কেলেঘাই"র জন্যে এই সংখ্যায় যারা কলম ধরেছেন, তাদের প্রতি রইলো বাসন্তিক শুভেচ্ছা। উপদেষ্টা ও পর্যালোচকদের সুচিন্তন মতামত সর্বদা "...ও কেলেঘাই"কে মোহনা প্রাপ্তির দিকে ধাবিত করবে এই আশা রাখি।

আনুচ্ছিকভাবে কিছু ত্রুটি থাকলে পাঠকগন তা ক্ষমার চোখে দেখবেন। পাঠকবর্গের গঠনমূলক মতামত আগামী সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসদ যোগাবে।

ড. মৃণ্ময় মণ্ডল
সম্পাদক
সহকারী সম্পাদক: শুভজিৎ জানা
...ও কেলেঘাই
মার্চ-২০২২

-কল্পবোধ-

।। তবু নদী এবং আমরাও ।।

বি ষ্ণু প দ   দা শ

নদী বাঁকে আজ রং তুলি ক্যানভাসে
ব্রীজের উপর হিজল গাছের ছায়া-
ফিসফিস করে কতনা কথার স্রোত
অক্টোপাশে তবু ঘিরে কত মায়া।

তুখোড় জীবন ক্লিশে হয়ে গেছে আজ
সদ্য কিশোর কিশোরীর যত খেলা;
স্কুল ছুটি হলে অভিসারে যেত মন
কেলেঘাই যেন মিলনের এক মেলা !

হিজলের জলে চুমু খায় এসে চাঁদ
ফনা তুলে নাচে বিবরের সাপ যত,
প্রেমপারাবত আসেনাতো আজ ফিরে-
কাল মধুমাসে বিরহ যাপন কত।

উথাল-পাথাল নীরব কথকথা
অঞ্জলি ওমে যৌবন সাঁতরায়-
থমকে দাঁড়ায় ঊর্মিমুখর রাত
টোকা মারে কেন আমাদের দরজায় ?

।। কথানদী ।।

কৌ স্তু ভ   শ ত প থী

যদি একবার ডাকে বারবার ফিরে যাই
এঘাটে পারানি কম আটপৌরে কেলেঘাই
অজানা সোঁতার থেকে ছাপোষা খালের জলে
ঘোলাটে স্রোতের নীচে শ্যাওলারা মখমলে

দগ্ধ দহন দিনে সব হারিয়ে সে দেউলিয়া
গাভী চরে তার বুকে বাঁশি বাজে রাখালিয়া
বালিতে আলতো ছুঁয়ে পেরিয়েছি যদি
পারানি মাঝিকে দিই নাকি দাবীদার নদী ?

যাত্রী চায়নি সে খেয়ালি ডিঙির আচমন
খেয়াঘাটে ভাটিয়ালি, নিভৃতে কিছুটা ক্ষণ
নুড়ির মতই ছড়ানো তার দুপাশের জনপদ
উদয়ে অস্তে আনমনে আঁকি তটিনীর প্রচ্ছদ

।। খেয়াঘাটের অন্তরে ।।

মৃণ্ময় মণ্ডল

গ্রীষ্মের প্রবল দাপট, ক্লান্ত শরীর পেতে চায়
বর্ষার দুরন্ত স্রোত, এপার-ওপার
ভাঙনের চূড়ান্ত আঘাত শেষ করে দেয়
শীতের আলস্য মাখা ভোর।
আমি খেয়াঘাটে এসে বসি
অস্থিরতায় উত্তাল বিকেল ছুঁয়ে শুধু
প্রতিশ্রুতি জলোচ্ছ্বাস
আমাকে আরো বসিয়ে রাখে, খেয়ার পাশে।
খেয়া-ই আমার জীবন-ভোর, সূর্য ওঠা দিন
খেয়া-ই আমার বন্ধু-সখা, ভাবনার যত লীন।
তারপর-
মোহনা প্রাপ্তির মতো তোমাকে পাওয়া,
খেয়া পারাপারে
তখন খেয়াঘাট জুড়ে মাঝিকে দেখিনি-
বহুকাল।

।। জলজ স্বপ্নের মতো করে দেখি ।।

শুভদীপ চক্রবর্তী

কেলেঘাই নদীর জলে রাখা যায় উৎকর্ণ বিরুদ্ধতা
শুদ্ধ হংসের চোখ তখন জলজ স্বপ্নে আবিল হয়ে আসে
কেউ এই সমারোহে স্বচক্ষে তাকায় না কেবল অন্তর ছাড়া;
বিদগ্ধ মাঝির বুকে শ্রাবণের শেষ বিন্দুর মতো ঊর্মিসম্ভাষণ।
মনুষ্য নদীর কাছাকাছি অজানা ঘ্রাণ ঘোরাফেরা করে
কত মানবীর গায়ে গিয়ে ওঠে নির্লিপ্ত বৃক্ষের বাল্যবন্ধুতা
তবু নিস্তলে নদীর ভাঙন-শব্দ ক্রমশ বিদ্ধ করে কান,
বিদ্ধ করে রাজর্ষি হরিণীর ব্যাঘ্রব্যাকুলতা।
চূড়ান্ত প্রাণদণ্ডী আলোয় তখন মৃত্তিকাহীন বোধিসত্ত্ব তাপ
সংকুচিত পুষ্পমঞ্জরির কাছে প্রগত সভ্যতার জল রাখা আছে।
সেই জল বিষাদের নয়, সেই জল নয় শেষতম বারি
কেলেঘাই নদীর জলে রাখা যায় উৎকর্ণ বিরুদ্ধতা
অতঃপর তোমার শরীরে কোথাও কোনো নদীবন্দর নেই....

।। খেয়াঘাটে ।।

সুমন মল্লিক

জলে নেমে যায় স্বপ্ন – স্নানে এত আগুন !
আস্তে আস্তে খুলে যায় মুঠো,
বেরিয়ে আসে মেঘাবৃত এক দিনের ছবি।
ছলাৎছল ছলাৎছল – ঢেউ – তাতে চাঁদের
আলো নেচে ওঠে – স্নানে এত আগুন !
ওই যে বেগমবাহার হাওয়ায় দোলে,
তার পাশে কে যেন বসে গান গায় মধুর,
আস্তে আস্তে মুঠো খুলে যায় আবার,
বেরিয়ে আসে মুগ্ধস্থির করা একটি রাত।
খেয়াঘাটে এলেই জলে নেমে যায় স্বপ্ন
আর আমি তা দেখে যেন দৃষ্টি ফিরে পাই।
স্নানে এত আগুন! এত আগুন স্বপ্নের স্নানে !

।। ধ্রুবক ।।

পলি দে

জনপদ বলল
তুমি ক্লান্ত হও না?
ইচ্ছে করে না
একটু বিশ্রাম নিতে?
কেলেঘাই বলল
আমি বাহক।
তুমি স্থির কেন?
তোমার ইচ্ছে করে না
পৃথিবীকে দেখতে?
জনপদ বলল
আমি ধারক।
জীবন বলল
আমি উভয়কেই চাই।
ধারক এবং বাহক।
বাঁশীওয়ালা বললেন
সব আপেক্ষিক।
আমি ছাড়া..

।। জলের আসমান ।।

বি কা শ চ ন্দ

কালের গর্ভ লুকিয়ে আছে জলের গভীরে
জলের ভেতর জলের জন্ম শরীর চিরন্তন
অন্তিম সময়ও দিন গোনে জলের শয্যায়
#
কালো মেঘে কালি মাখে নদী
যন্ত্রদানব খুবলে দেখেছে গর্ভ যোনি কুণ্ড
আঁজলা ভরে যে জল তুলি চুম্বনে
সে জলেতেই আদুল নাচ তুমুল মৃত্যু কুণ্ডলী
স্বভাব দোষের ধ্বংস লীলা দেখে
দিন দিন বেড়ে ওঠে জীবনের বিলাপ
অনিশ্চিত সময়ে অপেক্ষা শুধু ঘোলা জলে হাহাকার
নির্ভার প্রত্যাশায় জলতরঙ্গে জীবনের বন্দনা
#
ওপাড় জুড়ে তবু অলৌকিক অভিমান
বৃষ্টি চাইতেই হবে প্রাণ জুড়ে নিতে হবে জল
তবুও জলের নদীর কাছে
বাঁধা আছে জীবনের যত অভিমান
আমরাই পরম্পরা সন্তান সন্ততি
জল জমিনে ঘাই তোলে আকাল সংকেত
দু'পাড়ে পাড়ায় মন্দির মসজিদ পূজা পাঠ আজান
কেলেঘাইর দিলদরিয়ায় জলের আসমান

।। কেলেঘাই ।।

ম নো তো ষ আ চা র্য

পুরোনো ভিটের কাছে মাঝরাতে হু-হু জ্বলে স্মৃতি
পাতায় মুড়েছি শুধু নষ্ট এক জীবনের কথা
সন্ধ্যাতারা নেমেছিল, পাদপীঠ বিরহখচিত
জোনাকি মুদ্রিত ভাষা পাঠ সেরে আঁধারের অগ্রন্থিত পুথি
ব্যাকুল কান্নার ধ্বনি উবে যায় শব্দব্রহ্মলোকে...

পুরোনো শস্যের বীজে অঙ্কুরিত সম্পর্কের নম্র আখর
রেণু ছড়িয়ে জেগে আছে অভয়মুদ্রায়
আকাঙ্ক্ষার জ্যোৎস্না মেখে ফিরে আসি, কেলেঘাই ডাকে
জলজ ভাষায় ---
ক্ষতচিহ্ন সারানোর গীতিময় থানে।

।। বর্ণ ।।

বা সু দে ব গা য়ে ন

তোমার হাত ধরে দেখেছি
বড় গাছ, লাল ফুল, সোজা পথ
তবু আপন করে ভাবিনি তোমাকে।

সুষম ফ্রেমের ভাঁজে
তোমাকে আত্মীকরণ করি
যাতে হলো এ লেখা, এ ভাষা।

তোমাকে উচ্চারণে-
রাতের কুয়াশা শিশির হয়,
পাখি ডাকে,ফুল ফোটে, কবির কলম হৃদয়
জুড়ায়,
অবোধ শিশু ঘুমায় শস্য বোঁটা মুখে।

ঘরের উঠোনে গান গায় উইপোকা,
বারান্দায় রোদ ঝরে;
বিকেলে বুড়িমা তানপুরায় সুর তোলেন,
একুশে উচ্চারণে
সন্ধ্যা ঘনায় কেলেঘাই চরে।

।। কেলেঘাই ।।

স ন্দী প ন বে রা
আমাদের ছোট নদী কতো কথা বলে
অতীতের গল্পেরা আজও ভিড় করে।
বয়ে যায় অভিমান
ধীর গতি পথে,
কখনও বর্ষা এলে
বিভাজিত জলধারা তার
উচ্ছ্বাসে সে ঢেউ তুলে।

এক সুতোয় বেঁধে রাখে
তিন জেলার খেটে খাওয়াদের,
স্নান করায় শিশির ও জোৎস্নায়।

খড় টালি টিন
তাল খেজুরের বন,
যাদের চোখের জলে ভাসে
সেই কৃষকের হাসিতেই বালি
মিশিয়েছে চেনা রঙ,
রঙের দ্বন্দ্বে বাঁধ ভাঙে ভরা বর্ষায়
ডুবে যায় সব দেওয়াল, চাপা পড়ে আশা।

তবু তার এক আঁজলা জলে
তিন জেলাকেই পাই
আমাদের রক্ত প্রবাহে
মিশে আছে কেলেঘাই।

।। পারাপার ।।

শু ভ জি ৎ জা না

গোধূলির পর এ তল্লাটে তেমন মানুষের আনাগোনা নেই। পরান মাঝি তাই নৌকাটা হিজল গাছের শিকড়ে বেঁধে একটা বিড়ি ধরায়। ফাল্গুনের মিষ্টি দক্ষিণা বাতাস বিড়ির ধোঁয়াকে কেলেঘাইর ঘোলাটে জলের উপর দিয়ে মোহানার দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিভু নিভু পশ্চিমী আলোর ছটায় ধোঁয়াগুলি নানান রঙের হয়ে পরানের থেকে দূরে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। যেমন হারিয়ে গেছে তার জীবনের বিয়াল্লিশ বছর। এই হিজলের ঘাটেই কেটেছে আটাশ বছর। দিন রাত এপারের লোক ওপারে, ওপারের লোক এপারে পারাপার করতেই তার আনন্দ। পারাপার করে যেটুকু অর্থ সে পায়, তা দিয়ে দিব্যি চলে তার একার সংসার। পশ্চিম আকাশ থেকে ফাল্গুনী জোছনার দিকে তাকিয়ে থাকে পরান। এমনই এক সন্ধ্যায় কেলেঘাইর রুপালী জল ভীষণ আকৃষ্ট করেছিল তার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটাকে। তারও ছিল চাঁদের মতন মুখখানি। মনে হয় তাই কেলেঘাই ভুল করে চাঁদ ভেবে মেয়েটাকে কোলে নিয়েছে, আর ফেরত পাঠায় নি। তাই দুঃখ পরানের আছে তবে রাগ নেই কেলেঘাইর উপর। সারাদিন পরান তাই এই হিজল গাছের কাছে বসে কেলেঘাইর স্রোতে তার মেয়েকে খুঁজে বেড়ায়। আজ সেই দিন, যে দিন ফুটফুটে মেয়েটাকে কেলেঘাই কোলে নিয়ে ছিল। তাই

পরানের আজ বাড়ি যেতে ভালো লাগছেনা। পোড়া বিঁড়িটা ফেলে সে পুনরায় আবার একটা বিঁড়িতে আগুন দেয়। রাত গভীর হতে থাকে। দূরে গ্রাম গুলিতে সবেমাত্র আলো গুলো নিভতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়-

-পরান জ্যাঠা আমি সঙ্গমী।

হাতের বিঁড়িটা পরান ফেলে দিয়ে

-এত রাতে। কোন বিপদ ঘটলো নাকিরে মা ?

-তুমি-তো জানোই, অনেক দিন ধরে আমার পরিবার আমার বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কেউ

আমার মনের কথা জানতে চাইছে না। আমি নেধুয়ার বিপিনকে ভালোবাসি। ওকেই বিয়ে করবো। এ শরীর, এ মনের অধিকার কেবল বিপিনেরই। আমি অন্য কোন পুরুষের কাছে তা সমর্পণ করতে পারবো না। ঐ দেখ ওপারে বিপিন আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

নদীর ওপার থেকে একটা মিট্‌মিটে আলো দেখতে পায় পরান।

-জ্যাঠা, যদি তুমি আমায় আজ ওপারে না পৌঁছে দাও তবে এই কেলেঘাইর স্রোতে আমি

হারিয়ে যাবো। এখন কেলেঘাই আমার জীবনে সবথেকে বড় বাধা।

কথাটা শোনা মাত্রই পরানের সারা গা দিয়ে একটা চেনা কম্পন মাটি ছুঁয়ে গেল। সে আর দেরি করলো না কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। নৌকার দড়িটা হিজলের শেকড় থেকে খুলে, দাঁড়টা শক্ত করে ধরে-

-আয় মা। ওরা চলে আসার আগে তোকে বিপিনের কাছে পৌঁছাতে হবে। যা মা তোর মনের বাসনা পূরন কর।

সঙ্গমীকে বিপিনের কাছে পৌঁছে দিয়ে, পরান অন্ধকারে কেলেঘাইতে নৌকা ভাসিয়ে দেয় আর মনে মনে ভাবে আমার মেয়েটাও আজ বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠতো।

।। বেহুল্যার খেয়া ।।

শ্রী দে বা শি স কু ই লা

নদীমাতৃক বেহুলা বাংলার বুকে বয়ে চলেছে কত নাম না জানা নদ-নদী। আবার কেউ সামান্য খ্যাত-যেমন 'কেলেঘাই'। আর এই সকল নদীর তীর জুড়ে রয়েছে কত গল্প-কাহিনী, কত মন্দির, কত খেয়াঘাট। তেমনি এক খেয়াঘাট বেহুল্যার খেয়াঘাট। কলকল ছলছল শব্দে বয়ে যায় আমাদের প্রিয় নদী কেলেঘাই। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, সবং, ও পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর, ভগবানপুর থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই নদী। আর এই প্রবাহমান স্রোতধারায় রয়েছে বেহুল্যার খেয়াঘাট, তালাডিয়ার খেয়াঘাট,-আমগাছিয়া,-নাগলকাটা-কাঁটাখালি ও চাব্বিয়ার খেয়াঘাট, আরো কত শত জনপদ।

‘সুখ যাপনের স্মৃতির ভেলায়
বাইছি খেয়া আজও হায়’।

বেহুল্যার খেয়াঘাট আজ এক স্মৃতির শাম্পান। এই খেয়া ঘাটে হয়তো অতীতের কোন এক অরুণ প্রাতের তরুণী বেহুলা তাঁর ছোট নৌকায় খেয়া বাইতো লোক পারাপারের জন্য। তাই এই খেয়াঘাটের নাম 'বেহুল্যার খেয়া'ঘাট।

এই খেয়াঘাটের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে পটাশপুর থানার অন্তর্গত সেলমাবাদ গ্রাম আর উত্তর প্রান্তে রয়েছে সবং থানার অন্তর্গত গ্রাম রাউতরাবাড়ি। স্থানীয় লোকেরা বলেন আগে এই স্থানে কেলেঘাই নদী পারাপারের জন্য নৌকা চলত এখন বাঁশের ব্রিজ তৈরি হয়েছে। এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য কোক্তিপুর কোলন্দা, বাঁঙ্গাঁলদাঁড়ি, বিলকুয়া, নেধুয়া প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা যেমন এই খেয়াঘাট দিয়ে যাতায়াত করেন তেমনি গোপালপুর, পাথরঘাটা, টেপরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা ও যাতায়াত করেন। কেলেঘাই নদীর তীরে মকর সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় বিখ্যাত তুলসীচারার মেলা। নদীর বিস্তৃত চরে এই মেলা বসে আর দূরদূরান্তের মানুষ বেহুল্যার খেয়া পেরিয়েই এই মেলা দেখতে আসেন।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত (প্রায়) পালতোলা নৌকায় নদীর মোহনা থেকে বেহুল্যার খেয়া পর্যন্ত ইট বালি ও মানুষজন পরিবহন চলত। আজও ভুটভুটি নৌকায় কমবেশি এই কাজ চলে। কেলেঘাই নদীর সংস্কারের পর এই বেহুল্যার খেয়া পর্যন্ত জোয়ার ভাটা খেলতো। আজও কখনো কখনো এই খেলা চলে। লোকশ্রুতি রয়েছে স্বয়ং চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপ থেকে শ্রীক্ষেত্রে পদব্রজে যাত্রা করেছিলেন তখন তিনি পরিষদবর্গ নিয়ে এই বেহুল্যার খেয়া পেরিয়ে গিয়েছিলেন। এবং পাথরঘাটার মহাদেব মন্দিরে রাত্রি যাপন করেছিলেন।
সেই কারণে কেলেঘাই নদীর তীরে অবস্থিত এই বেহুল্যার খেয়াঘাট আজও আমাদের কাছে এক পবিত্রতম তীর্থ স্থান।

।। বাংলার প্রাচীন লোহরা সেতু ছিল মেদিনীপুরে ।।

বি শ্ব সি ন্ধু দে

বাংলার একটি প্রাচীনতম নিদর্শন হারিয়ে গিয়েছে। হারিয়েছে সভ্যতার অগ্রগতির স্বাভাবিক নিয়মে। সেই নিদর্শন ছিল বাংলার প্রাচীনতম সেতুর। তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলার প্রাচীন সেতুর গৌরবের অধিকারী ছিল মেদিনীপুর। এখনকার ভৌগোলিক সীমা অনুযায়ী বললে পশ্চিম মেদিনীপুর।

সেতুটির অবস্থান ছিল নারায়ণগড় ব্লকের পোক্তাপোলে। ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোডে কেলেঘাই নদের উপরে। সেতুর গায়ে একটি মূর্তি খোদাই করা ছিল। স্থানীয় ভাবে যার নাম ছিল 'মল্লিকা'। ওই এলাকায় দু'টি সেতু ছিল। একটি সেতু প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। ঝামাপাথর দিয়ে লহড়া ধাপ পদ্ধতিতে তৈরি। অন্য সেতুটি ছিল গাঁথনি দেওয়া খিলানের। 'মেদিনীপুর: সংস্কৃতি ও মানবসমাজ' বইয়ে লহড়া পদ্ধতিতে নির্মিত সেতুটিকে বাংলার প্রাচীনতম সেতু বলে উল্লেখ করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক তারাপদ সাঁতরা। এই অঞ্চলের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সন্ধানে তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন বহু জায়গা।

সেতুটির প্রাচীনত্ব নিয়ে খোঁজ শুরু হয় গত শতকের আশির দশকে। তার কারণও ছিল। সেই সময়ে 'ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেস'এর ৩৮তম অধিবেশন উপলক্ষে পূর্ত দফতর থেকে একটি বই প্রকাশিত হয়। যার নাম 'হাইওয়ে ব্রিজস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'। বইয়ের ভূমিকায় দাবি করা হয়েছিল, সতেরো শতক

থেকে সেতু নির্মাণ শুরু হয়। ইমারতি বাস্তুবিদ্যায় সীমিত জ্ঞানের কারণেই দক্ষিণবঙ্গে সহজলভ্য ইট-পাথর দিয়ে খিলান সেতু নির্মাণ শুরু হয়। ভূমিকায় এমন সেতুর উদাহরণ হিসেবে ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোডের উপরে পোক্তাপোলের দ্বিতীয় সেতুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড তৈরি হয়েছে ১৮২৬ সালে। তাহলে সেই রাস্তার উপরে তৈরি সেতু কী করে প্রাচীন হয়? তারাপদ সাঁতরার মত, ওড়িশার গঙ্গ বংশীয় রাজারা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে মেদিনীপুরের কিছু অংশে রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। পোক্তাপোলের ধাপ পদ্ধতিতে তৈরি সেতু ওড়িশার রাজাদের আমলেই তৈরি হয়েছিল। ওড়িশার যাজপুরে এগারো নালার সেতু এবং পুরীর কাছে মধুপুর নদীর উপরে আঠারো নালার সেতুর নির্মাণ পদ্ধতিও পোক্তাপোলের মতো। এই দু'টি সেতু আরও প্রাচীন।

বাংলার প্রাচীন সেই সেতু আর নেই। এখন খড়্গপুর-বালেশ্বর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের তৈরি লম্বা কংক্রিটের সেতু। তবে সেই 'মল্লিকা' মূর্তি অক্ষত আছে। নতুন সেতুর কংক্রিটের থামের দেওয়ালে আটকে দিয়েছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। পাশে রয়েছে আরেকটি মূর্তি। তার কোনও ইতিহাস মিলছে না। মল্লিকা নিয়ে কিংবদন্তী রয়েছে। প্রতিবছর পয়লা বৈশাখ এলাকায় মেলা হয়। বৈশাখী মেলা। পুজো পান মল্লিকা। দূর দূরান্ত থেকে মল্লিকার মহিমায় ছুটে আসেন অনেকেই। পুজো দেন। পায়রা ওড়ান। মূর্তির পূজক গোবিন্দ উথাসিনী জানালেন, অন্ত:সত্ত্বা মেয়ে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। জল তেষ্টা পেলে কেলেঘাইয়ে নেমে হারিয়ে যান। পরে বাবা স্বপ্নাদিষ্ট হন। সেই থেকে সেতুর গায়ে বাবার সঙ্গে ফেরা মেয়ে 'মল্লিকা'র' মূর্তি বসানো হয়। লোকবিশ্বাস, সেতুর

নীচ দিয়ে গলে মল্লিকার পুজো দিলে নিঃসন্তান মহিলার সন্তান হয়। দৈবী সংস্কৃতির পরম্পরা রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। শুধু হারিয়েছে প্রাচীন সেতুর ঐতিহ্য। এখনকার কংক্রিটের পোলের নীচ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে নদের। দিন দিন মানুষের ও প্রকৃতির কর্মকাণ্ডে মজে যাচ্ছে নদ। তেমন ভাবেই ইতিহাসেও জং ধরছে। এ ইতিহাস হয়ত কম লোকেই জানেন। সংস্কার যাই থাক ইতিহাস প্রাচীনতার কথাকেই সামনে আনে।

।। সমীক্ষার পটভূমি- কেলেঘাইর উৎস সন্ধানে ।।

কৃ ষ্ণ গো পা ল   চ ক্র ব র্তী

মনে পড়ে কি! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই নদের চাঁদের নদী প্রেমের কথা। পড়লেই বা কি করতে পারি আমরা! ওর মতো তো আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার চাকায় পিষে মরতে পারিনা। ও এটাই ভাবছেন; নদীর কষ্ট দুঃখের কথাই তো নদের চাঁদ ভেবেছিলো, তাকে তো নদী তার বুকে টেনে বাঁচাতে পারেনি। আসলে সাহিত্যিকের ভাবনাটা ছিল এমনই যে প্রকৃতি ও আধুনিক সভ্যতা একে অপরের হাত ধরে চলবে অর্থাৎ ব্যালেন্সিংটা জরুরি। আর আমরা নদীর থেকে যখন যেমনটা চাইবো, তখন তেমনটা না পেলেই আমাদের সঙ্গে সংঘাতটা জোরদার হবে, এটাই কি স্বাভাবিক? আমাদের প্রয়োজনে আমরা তার শরীরে আঘাত, অত্যাচার, শোষণ সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত করবো, তবুও আমাদের দিতেই হবে। কিন্তু আমরা কখনো ভেবে দেখিনি নদীটা কেমন আছে? তার যন্ত্রনার কথা আমরা কখনো কান পেতে শুনতেই চাই না। শুধু চাওয়া পাওয়ার অঙ্কটা কষতে থাকি দিবারাত্রি। আর নদী শরীর ও তার জীবনের কথা ভাবিনি বলেই নদী আমাদের নিয়ে তার ভাবাটা বন্ধ করতে বসেছে। আসলে সভ্যতার আধুনিকীকরণের নামে যে চাকাটা আমরা সামনের দিকে গড়াচ্ছি, তাতে নদী প্রতিনিয়ত বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, আগামীতে তার মাত্রা আরও বাড়বে বই কমবে না। তাই নদীর ভালো-মন্দের কথা বেশি করে ভাবতে হবে আমাদের। তবেই ভরন পোষণের কথা ভাববে নদী, যেমনটা ভেবে এসেছে এত কাল। ঠিক

এই জটিল সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা কয়েকজন "...ও_কেলেঘাই" ওয়েব জার্নালের পক্ষ থেকে আমাদের প্রাণের নদী কেলেঘাইর উৎস মুখ দর্শন, তার গতিপথ এবং সেই সঙ্গে হাজার হাজার বছর ধরে নদীর দুপ্রান্তে বসবাসকারী মানুষের জন্য নদীর দান কতোটা, তার খোঁজ শুরু করেছি। ধারাবাহিকভাবে আমরা চালাবো এই সমীক্ষা সংগ্রহের কাজ। যারা নদী ভালবাসেন- কেলেঘাইকে ভালবাসেন আমাদের এই প্রয়াসের সঙ্গী হতে পারেন।

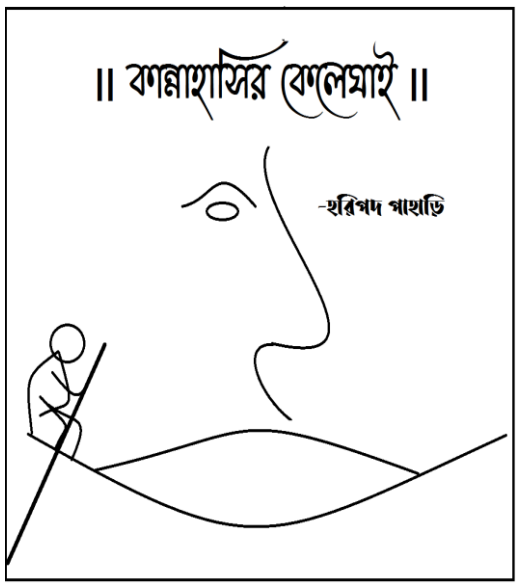

“কান্নাহাসির কেলেঘাই”

-হরিপদ পাহাড়ি

প্রায় হারিয়ে যাওয়া এক উপন্যাস। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কেলেঘাই নদীকেন্দ্রিক সমাজ জীবনের আবহচিত্র নৈপুণ্যতার সহিত বর্ণিত করেছেন ঔপন্যাসিক হরিপদ পাহাড়ী মহাশয় তার “কান্নাহাসির কেলেঘাই” তে। উপন্যাসের শুরুতে নিকুঞ্জ চরিত্রের উদাসী মনোভাব ও সারল্যতা নদী তীরবর্তী সমাজের সমসাময়িক মনুষ্য-মানবিকতার গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্পর্কের সরলতা সারা উপন্যাস জুড়ে এক নিবিড় বোধ পাঠককে ভাবিয়ে তুলবে। নদীমাতৃক প্রান্তিক জীবনের অসহায়তা, আবেগ, ইচ্ছে, অবকাশ সবই সুমন্ত চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। কেলেঘাই নদীর প্রবল বন্যায় যেমন সমাজ জীবন বিপর্যস্ত, শোকস্তব্ধ হাহাকার গ্রাস করে বাসিন্দাদের তেমনি এই নদী তার উর্বরতা দিয়ে শস্যশ্যামল করে তোলে মাঠের পর মাঠ, জলার পর জলা। আঞ্চলিক গবেষকরাও পেয়ে যাবেন কিছু কিছু ইতিহাস। কেলেঘাই-অপরূপ তার প্রবাহ পথ, সেই পথে সুমন্ত আবিষ্কার করে প্রেম, প্রীতি ও বাঁচার কৌশল। সৌন্দর্য তার ছলনাময়ী স্রোতের তালে, শুধু সেই সৌন্দর্য উপভোগের জন্য সুমন্ত হয়ে উঠতে হবে পাঠককে। সব শেষে বলা যায় কেলেঘাইর অতীত সমাজ জীবন জানতে গেলে “কান্নাহাসির কেলেঘাই” একটি আকর গ্রন্থ।

লেখকের অনুমতিক্রমে ও ইচ্ছায় শীঘ্রই পুনঃপ্রকাশিত হবে “কান্নাহাসির কেলেঘাই” ‘...ও কেলেঘাই’ ওয়েব জার্নাল থেকে।

www.keleghai.in